অরুপরতন বসু

কারুবাসনা ও জীবনানন্দর গদ্য

'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে···কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভ'রে দিয়েছে ছাই কালি ধূলির শূন্যতায়। যে উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটরকার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে (সেই) আকাঙ্ক্ষা—উদ্যম নেই আমার' (কারুবাসনা)।

এই হচ্ছে বাঙলাসাহিত্যের প্রথম আধুনিক গদ্য, অথবা বলা যায় আধুনিক বাঙলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন, যা রবীন্দ্রপরবর্তী বাঙলা গদ্যকে প্রায় দু-ভাগ করে দিয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯৩৩ সালে লেখা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছিল প্রায় ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে ছাপা হয়ে বেরোনোর জন্য। এই ৫৩ বছরে মানুষ প্রায় বুড়ো হয়, অথচ দেখতে পাচ্ছি এই লেখাটি যেন ক্রমশ নবীন. ক্রমশ আরো উজ্জ্বল, গভীর ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, যেমন কবিতায়, তেমনই গদ্যে, জীবনানন্দই হচ্ছেন, বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার জনক।

উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে এইভাবে :

'আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড় ক্ষতি হয়। কয়েকদিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরোনো। ছেঁড়া-খোঁড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখেমুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে।'

এর পর বই কেনা সম্পর্কে কিছু কথা :

'গতবছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশনি করি, ট্রাম—সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা সাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম : ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর. একখানা নভেল এবং আরো দু-তিনখানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনিনি ; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়, ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেকদিন ধরে দেখিনি ; বই ক'খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি।'

এবার বলা হবে বই পড়ার কথা :

'টিনের সুটকেসে ক'রে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম, খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম, বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি : শালিখ ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে, দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।' লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে বইয়ে কী ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। শুধু কীভাবে বই পড়া হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। এরপর আসছে উইপোকার কথা :

'আমাদের এ ঘরে উইয়ের অত্যাচার বড় বেশি। মেঝেটা মাটির—বহু স্যাঁতসেঁতে ; বর্ষাকালে উইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানারকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়, খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়েঘরে তিনি উই ছড়িয়ে দিয়ে তামাশা দেখেন। নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি ; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।'

এরপর ফের বইপড়া সম্পর্কে আরো দু-চার কথা বলি। "কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।' কল্যাণী সেলাই করছিল। কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে—'মাঝে মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত ; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব ; থাকতে থাকতে তিনমাস হয়ে গেল। প্রায় একমাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।"

এইবার ঘটনা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা শুরু হল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এই মর্মান্তিক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য কোনো ঘটনার ঘনঘটা, মারপ্যাঁচ, নানান প্লট, চরিত্র-চিত্রণ এসব কিছুই নেই। কোনো গল্প নেই। আছে আন্তরিক আত্মকথন আন্তরিক কথোপকথন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কি আধুনিক উপন্যাস? আধুনিক গদ্য? এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আগেই বলেছি রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় অন্তত জীবনানন্দর কবিতা ও গদ্যচর্চা তাই করেছে। এর একভাগে রয়েছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত সাহিত্যরীতির সঙ্গে যার আত্মীয়তা নেই, যার মধ্যে কল্লোল, পরিচয় ও দেশ আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বিপুল গদ্য সাহিত্য কর্ম—যাঁদের অনাধুনিক বলা ছাড়া উপায় নেই। অন্যদিকে রয়েছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত সাহিত্যরীতির সঙ্গে যাঁদের আত্মীয়তা আছে। বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ি, কমলকুমার মজুমদার,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ। বলা যেতে পারে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক গদ্যকার এঁরাই। তুলনায় ক্ষীণকায় ও স্বরূপ পরিচিত হলেও এটিই হচ্ছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্তঃশীল প্রবাহ। 'আধুনিক' ও 'অনাধুনিক' এই শব্দ দুটি নিয়ে এবার তর্ক উঠতে পারে। কাজেই প্রথমেই বলে নেয়া ভাল যে অনাধুনিক হলেই তিনি মহৎ গদ্যকার হবেন না এমন কথা নেই, কেননা শরৎচন্দ্র, মাণিকবাবু, তারাশঙ্কর এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের স্রষ্টা নন, কিংবা আধুনিক গদ্যরীতির অনুসারী নন, কিন্তু এঁদের সাহিত্যকীর্তির মহত্ত্ব সম্পর্কে কে সন্দেহ করবে? উল্টোদিকে 'আধুনিক' শব্দটি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থ নিয়ে এসেছে, যেখানে সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৈতন্যের এমন একটি স্তরকে ছোঁওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-প্রচার লোকশিক্ষা, ইতিহাস-চেতনা, রাজনৈতিক প্রচার এসব কিছুই নয়, যা সৃষ্টির রহস্য তথা এক কালহীন অনন্ত সত্যের গূঢ় শৃংখলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এইদিক থেকে দেখতে গেলে আধুনিক গদ্য সাহিত্য, আধুনিক কবিতার অনেক কাছাকাছি চলে আসে। স্মার্ট, ঝরঝরে, চালাক, রাগী কিংবা আক্রমণাত্মক গদ্য নয়। বরং সম্পূর্ণ উল্টোটাই হচ্ছে এই গদ্যরীতির ভাষা, আর এসবই হচ্ছে সেই মানুষের কথা, যার সামাজিক সফলতা নষ্ট হয়ে গেছে। যার 'সংসার ভরে গেছে ছাই কালি ধূলির শূন্যতায়।'

এইজন্যই আমি গোড়া থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছি। চোখের সামনে, হাতের কাছে, লেখার মধ্যে যদি তাঁর নিজের লেখার একটি নিদর্শন থাকে, তাহলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হবে প্রচলিত অনাধুনিক গদ্যের তুলনায় কোথায় জীবনানন্দর গদ্য আলাদা, কেননা জীবনানন্দর দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই, আর আধুনিক বাঙলা গদ্যের দৃষ্টান্ত তিনিই।

এইবার একটি জিনিস লক্ষ করার মতো যে, তাঁর এই উপন্যাস প্রায় ৫০ বছর বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। তাঁর বিচ্ছিন্ন কিছু গদ্যের ইস্তত নমুনা যে আমরা আগেই হাতে পাইনি তা নয়, কিন্তু তবুও তাঁর গদ্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণই থাকত যদি না তাঁর উপন্যাসগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছত। মানতেই হয় যে তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি পড়ার পর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে, বাঙলা গদ্য সাহিত্য কি এই ঘটনার পর আমূলই পাল্টে যাওয়ার কথা নয়? জীবনানন্দর পূর্ববর্তী বা এমনকি সমসাময়িক লেখকদের কথা যদি আমরা বাদ দিই, (কেননা ৮০র দশকে তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি বেরিয়েছে) যদি শুধু আমরা তাঁর পরবর্তী লেখক ও পাঠক-সম্প্রদায়ের কথা ভাবি যাঁরা তাঁর উপন্যাসের সংস্রবে এসেছেন, তাঁরা কীভাবে আবার পুরোনো পাঠাভ্যাসে ফিরে যেতে পারেন, কীভাবেই বা পুরোনো রীতিতে সাহিত্য রচনায় ফিরে যেতে পারেন তাঁরা? যেমন ধরুন কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কায়দায় এমনকি কোনো ইস্কুলের ছেলেও এখন কবিতা লেখে না, তেমন ভাবেই কি জীবনানন্দ-পূর্ব গদ্যরীতি প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে না জীবনানন্দর এই গল্প উপন্যাসগুলি বেরোনোর পর?

এবার অবশ্যই আমাদের কয়েকটি জিনিস ভাবতে হবে, দেখে নিতে হবে এই আধুনিক গদ্যরীতির চরিত্র-লক্ষণ কী অথবা এর মূল বৈশিষ্ট্য কী। এই গদ্যরীতি, মূলত বিষয়-নির্ভর নয়, অর্থাৎ অবজেকটিভ নয়, যুক্তিবিরোধী নয়; কিন্তু যুক্তিবাদী কিংবা যুক্তি-নির্ভর নয়। এটা মেনে নিলে অবশ্যই একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে, দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে আমরা 'অনাধুনিক' বলছি, তাঁর গদ্যরীতির মধ্যেই আছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত গদ্যরীতির বীজ, অর্থাৎ আধুনিক গদ্যসাহিত্যের বীজ। যদি চতুরঙ্গের গদ্যভাষার কথা কারও মনে থাকে, মনে থাকে চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, ল্যাবরেটরি কিংবা রবিবারের কথা তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। সবসময় যদি নাও হয়, অন্তত অধিকাংশ সময় আমরা লক্ষ করব, রবীন্দ্রগদ্যভাবনায় গৌণ হয়ে পড়ছে বাইরের ঘটনা, বারে বারেই আত্মার ভেতরের ঘটনাগুলিই তৈরি করছে উপন্যাসের আকার, উপন্যাসের বিষয়। কোনো 'নির্লিপ্ত' সমাজবিজ্ঞানী বা 'বৈজ্ঞানিক'-এর মতো বাইরে থেকে কোনো ঘটনাকে লক্ষ করা নয়, বরঞ্চ চৈতন্যের এক সূক্ষ্ম স্তরকে দেখে 'সমগ্র' সত্যের মূলভূমিকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা। চতুরঙ্গে শচীশের অন্তর্ভ্রমণ, তার চৈতন্যের ঝড় ও তুমুল বিক্ষেপ যদি না-থাকত, যদি থাকত শুধুই শ্রীবিলাস ও দামিনীর প্রণয় পরিণাম, তাহলে তা হতো নেহাতই মেঠো গল্প, যতই শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসকে দামিনী স্বামী হিসেবে গ্রহণ করুক না কেন। অর্থাৎ যদি কেউ মনে করেন শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ গার্হস্থ্য জীবনেই আছে প্রেমের সম্পূর্ণতা, এরকম একটি ইঙ্গিত রবীন্দ্রসাহিত্যভাবনায় পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তিনি অবশ্যই নীতিগল্পের সুসমাচার সাহিত্যে খুঁজছেন, যা পাওয়া শক্ত। এবার আরেকটু লক্ষ করলে দেখা যাবে শচীশ-দামিনী সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব যে ভাবনা ও জীবনযাপনের ব্যবধান রয়েছে, প্রায় তারই কাছাকাছি— অন্তত অনুরূপ না-হলেও— একটি দূরত্ব রয়েছে জীবনানন্দর তিনটি উপন্যাসের স্বামী-স্ত্রী চরিত্রে, যথাক্রমে 'মাল্যবান', 'জীবনপ্রণালী' ও 'কারুবাসনা'য়।

কারুবাসনার কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, জীবনানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন: 'সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন? তা ঠিক নয়; শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখ-সুবিধা সুব্যবস্থা চায় বই কি, কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবয়বকে [উপলব্ধি] করে আনন্দ, ও অবয়ব সম্পৃক্ত নিষ্ফলতা, আবহমান কাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রয়ে গেছে।

একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখানা কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মতো স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে

অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট।··· শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন অনেক নাম রয়ে গেছে যারা না-খেতে পেয়ে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায়, কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায়।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের বক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায় নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি। কোনোদিনও পারবে না।'

এরপরই লিখছেন : 'চারদিকে ছায়া জমে গেছে ; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার।'

আর এই অন্ধকার, মেঘের রাজ্য থেকে গভীর স্মৃতির অন্ধকার থেকে উঠে আসে তাঁর চিরদিনের প্রেমিকা, বনলতার মুখচ্ছবি :

'কিশোরবেলায় যে-কালো মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—··· নক্ষত্রমাখা রাত্রির কালদিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার— প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী মেরীর মতো অপরূপ রূপ। মিষ্টি, ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্নশীতল নিরাবরণ দুখানা হাত ম্লান ঠোঁট। পৃথিবীর নবীন জীবন ও নরলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। সেই বনলতা— আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে।'

এরপর আরো কিছুকাল জুড়ে এক মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ, যার অন্তত বেশ কিছুটা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না, কেননা এখানেই গদ্য ও কবিতার সেই মিলনবিন্দু, যার আলো-আঁধারি জুড়ে বনলতার মুখচ্ছবি বারবার ভেসে ওঠে, যা আধুনিক গদ্য-রীতিরও এক দিকনির্দেশ, যেহেতু বাইরের আর্থ-সামাজিক ঘটনা নয়, আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, চৈতন্যের এক গভীর ও সূক্ষ্ম স্তরকে ছুঁয়ে যাওয়াই হচ্ছে আবহমান আধুনিকতা যা কিনা বিষয়গত বা অবজেকটিভ পদ্ধতির দ্বারা অসম্ভব।

তাহলে আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি বনলতার কাছে :

'···কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল বঁইচি ও হাতিশুঁড়োর অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত

দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে মাঝপথে গেল থেমে। তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।

অনেকদিন পর আজ আবার সে এল ; মনোপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ী পরে, চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে ; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা, নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—।'

এই দীর্ঘ মর্মান্তিক স্মৃতিচারণার পরই শুরু হচ্ছে দীর্ঘ সংলাপ, প্রায় ১০ পাতা জুড়ে পিতা ও পুত্রের মধ্যে। তারপর আরো আরো সংলাপ কখনো স্বামী-স্ত্রী, কখনো বাবা ও বাচ্চা মেয়ে কখনো মা ও অলস বেকার কারুবাসনাতাড়িত ছেলের মধ্যে, কখনো বা মা স্তব্ধ, ছেলেই শুধু অবিরাম অনর্গল কথা বলে চলেছে আপন মনে, বলা যায় একের পর এক দীর্ঘ মনোলগ— এক অদ্ভুত, বিচিত্র ব্যাপার ! অবশ্য জীবনানন্দর অধিকাংশ উপন্যাসে সংলাপের প্রাধান্য থাকলেও তার এতটা প্রাচুর্য বড় একটা দেখা যায় না, তবু আবেগ ও যুক্তিতাড়িত সংলাপের প্রায় বিদীর্ণ হয়ে ওঠা চেহারা দেখে ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার মনে পড়া স্বাভাবিক, আরো মনে পড়া স্বাভাবিক এইজন্যই যে এইসব সংলাপ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়েই লেখক তাঁর শিল্পভাবনা, দর্শন এমনকি গল্পের নাটক বা ঘটনা একটানা প্রায় ক্লান্তিহীন বলে চলেছেন নিছকই কথা বলার মেজাজে,— আর এই সবকিছু থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই উঠে আসে, তা হল উপন্যাস কোনো বিনোদনসংখ্যার সম্ভার নয়, উপন্যাস হচ্ছে অমোঘভাবে লেখকের অন্তর্জীবনের এক পরিচয়, উন্মোচন, যা নিছক আত্মজীবনী নয়, স্বীকারোক্তি নয়, স্মৃতিচারণ নয়, অথচ যার মধ্যে এই সমস্ত উপাদানই আছে মিলে-মিশে। এবার আধুনিক গদ্যের কয়েকটি চরিত্রলক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার জন্য আগের দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন ছিল। এইসব লক্ষণগুলিকে যদি আমরা একজায়গায় জড়ো করে কাছ থেকে লক্ষ করতে চাই তাহলে দেখতে পাব :

১। এতে সাধারণভাবে ডিটেকটিভ গল্পের মতো কোনো খুনের কিনারা করার জন্য কিংবা আততায়ীকে গ্রেপ্তার করার জন্য একের পর এক সূত্র সাজিয়ে, অর্থাৎ প্লট ব্যবহার করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর তেমন তাড়া নেই।

২। এমনকি যদি কোনো খুনের গল্পও আধুনিক রীতিতে লেখা যায় (যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে) তাহলেও খুনী কে, অথবা খুনী কীভাবে ধরা পড়ল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে খুনের পেছনে কী মানসিকতা ছিল, চৈতন্যের কোন

আবহাওয়ায় মানুষ হত্যার দিকে যায়, অর্থাৎ পাপকর্মের চৈতন্যের নানান রহস্যময় স্তর, নানান ভাঁজ খুলে লেখক তারও অতীত অপর কোনো চৈতন্যের স্বরূপ সন্ধানের দিকে যান।

৩। স্মৃতিচারণ, কল্পনার বিস্তার ও প্রায় কবিতার কাছাকাছি যেতে পারে এমন আবেগ-স্পন্দন তৈরি করার জন্য এমন ভাষা ও শব্দের ব্যবহার যা সাংবাদিক শব্দ ব্যবহারের বিরোধী, অর্থাৎ যা নিছক খবর সম্প্রচার, কিংবা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভাষা নয়।

৪। সংলাপ এখানে নেহাতই কথোপকথন নয়, বরং কথোপকথনের মাঝখানে সুযোগ পেলেই, কথোপকথনের এলাকা পেরিয়ে চলে যায় অনেকটা শেকসপিরীয় নাটকের মনোলগের দিকে, যার মারফৎ ব্যক্তি তার অন্তর্জীবনের বিক্ষোভ, অনুসন্ধান, প্রকৃতি এ-সবেরই আভাস দিতে পারে অপর ব্যক্তিকে।

৫। আর এর কোনোকিছুই সম্ভব নয় যদি আমরা বিষয়গত রীতি বা অবজেকটিভ রীতি এক্ষেত্রে ব্যবহার করি। অবজেকটিভ রীতি হচ্ছে দুর্মরভাবে আধুনিকতার বিরোধী। এই সত্যটি আমরা ব্যবসায়িক গল্প-উপন্যাসের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করব। সেখানে দেখা যাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা 'গল্প' বলে যাওয়ার ধুম পড়েছে। এখানে লেখক সবসময়ই ঘটনাগুলিকে বাইরে থেকে দেখেন ও দেখান। এমনকি নিজের জীবনের ঘটনাকেও তিনি দেখেন ও দেখান বাইরে থেকে। ফলে লেখকের ভূমিকা এখানে অনেকটা সর্বশক্তিমান নিউটনীয় খ্রিস্টান ঈশ্বরের মতো, যিনি বিশ্বজগৎকে বাইরে থেকে একটি অতিকায় ঘড়ি হিসেবে দেখছেন— অর্থাৎ যিনি জগৎকে 'অবজেকটিভলি' দেখছেন। ফলে এই জগতে 'ভবিষ্যদ্বাণী' সম্ভব, এখানে পরমাণুর মতোই চেতনার অবস্থান বা ব্যক্তিমানুষের অবস্থান জানলে তার পরিণাম বলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ ও তার চেতনা এই সবকিছুই এঁদের হিসেবের খাতায় ঠিকঠাক ধরা আছে, কোনো অনিশ্চয়তার জায়গা এখানে নেই। এঁদের ভাষাও এইজন্য খুবই ঝরঝরে, 'স্মার্ট'। যেমন বিশ্বজগৎ তেমনি মানবচৈতন্যকেও এঁরা পুরোপুরি হিসেবের খাতায় ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর এ ব্যাপারে দক্ষিণ ও বামপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে তেমন কোনো ফারাক নেই।

আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই এই নিয়ন্ত্রণমূলক সাহিত্যের বিরুদ্ধে। তার মানে অবশ্য এ-ও নয় যে আধুনিক সাহিত্য চূড়ান্ত বিচারে বিষয়গত তথা সাবজেকটিভ; কেননা তা যদি হত তাহলে সেন্ট অগাস্টাইন বা রুশোর মতো একের পর এক স্বীকারোক্তি লিখে গেলেই তা সাহিত্য হত, যদিও অগাস্টাইন বা রুশোর স্বীকারোক্তি যথার্থ সাহিত্য না-হলেও সাহিত্য পদবাচ্য।

এবার অবশ্য একটি অভিযোগ উঠতে পারে, যে পরমাণু এবং চেতনার আচরণকে তথা বস্তু ও চেতনাকে আমি একাকার করে দেখছি। চারপাশে অনেক সময়ই শোনা যায় যে সাহিত্যকে 'বিজ্ঞানসম্মত' হতে হবে, কিংবা সাহিত্যকে হতে হবে বৈজ্ঞানিকের মতো

নির্লিপ্ত। বিশেষত মাণিকবাবুর সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে তো হামেশাই একথা শোনা যায়। এরকম চালু ধারণা অবশ্য এখন প্রায় বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে, কেননা 'বিজ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানসম্মত' বলতে আগে যা বোঝা যেত এখন আর তা বোঝায় না। ঊনিশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার কাঠামো অনুযায়ী অনেকেই বুঝতেন 'বিজ্ঞানসম্মত' মানে একটি কঠোর-কঠিন নিশ্চিত 'অবজেকটিভ' বা বিষয়গত পদ্ধতি, যা বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রায় নাকচ করে দিয়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ হাইজেনবার্গ একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে পরমাণুর জগতে নিশ্চয়তা নেই, সেখানে কাজ করছে 'অনিশ্চয়তা বিধি' (বা principle of uncertainty) যার ফলে পর্যবেক্ষণ না-করা পর্যন্ত বলা যাবে না পরমাণু আছে না নেই। পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত পরমাণু থাকছে একটি সম্ভাবনার তরঙ্গের মধ্যে (probability wave) এবং তার অবস্থান জানলে আমরা বলতে পারব না তার ভর বা গতিবেগ কী, তার ভর বা গতিবেগ জানলে আমরা বলতে পারব না তার অবস্থান কোথায়, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে পরমাণুর জগতে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়, এবং তার থাকা না-থাকা নির্ভর করছে পর্যবেক্ষক বা দ্রষ্টার উপর। পরমাণুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে হাইজেনবার্গের মত : 'But then one sees that not even the quality of being (if that may be called a 'quality') belongs to what is described. It is a probability for being or a tendency for a being' অর্থাৎ বলা যেতে পারে পরমাণু হচ্ছে 'হওয়া'র সম্ভাবনা বা 'হয়ে ওঠার' ঝোঁক।

এর চেয়ে ভিন্ন মতামত হচ্ছে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদী ডেভিড বম-এর, যিনি মনে করেন বস্তুকণিকার 'বিষয়গত বাস্তবতা' আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এক বহুমাত্রাবিশিষ্ট গূঢ় শৃঙ্খলার (implicate order) ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপ (projection)। বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রের ছবি যেমন দ্বিমাত্রিক পর্দায় এক ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার প্রক্ষেপ, বস্তুকণাও তেমনই এক বহুমাত্রিক গূঢ় বাস্তবতার ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপ, চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপ যতটা বাস্তব, বস্তুকণিকাও ততটাই। বস্তুকণিকার জগতে অনিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমরা এখনো পর্যন্ত ঐ গূঢ় বা নিহিত শৃঙ্খলা সম্পর্কে কিছুই জানি না, হয়ত বা কোনোদিনই জানতে পারব না। এক্ষেত্রেও বিষয়গত বাস্তবতাকে পুরোপুরি মানা হচ্ছে না, আবার একেবারে নাকচ করাও হচ্ছে না।

সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এই দুটি মতই জরুরি, কেননা পরমাণু বা বস্তুকণিকার বাস্তব অস্তিত্ব থাক বা না-থাক, বিষয়গত বাস্তবতার যে একটি কঠিন নির্লিপ্ত চেহারা ছিল তা ধসে গেছে, যে মুহূর্তে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রমাণ করেছে যে এই মহাবিশ্বেরই একটি অংশ হচ্ছে মানবচৈতন্য এবং বস্তুজগৎকে আমরা দেখি বস্তুজগতের ভিতর থেকে তার অংশ হিসেবেই, আরো সহজ ভাষায় বলতে

গেলে মহাবিশ্ব হচ্ছে একটি 'সমগ্র', এবং এই সমগ্র থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। এইজন্যই অস্তিত্ববাদীরা একসময় যে ভজিয়েছিলেন মানুষকে প্রকৃতি বা বস্তুজগতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে, সেটা আর সঠিক বলে মনে হয় না। মনে হয় না কেননা মহাবিশ্বে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক হার এমনই সূক্ষ্ম হিসেবে কাজ করে চলেছে যা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলার পেছনে একটি পরিকল্পনা আছে। উল্টোদিকে মহাবিশ্ব, মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন এ কথা তখনই বলা সম্ভব যখন বস্তুজগৎ বা মহাবিশ্ব থেকে আমরা নিজেদের বা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখব। অবশ্য একসময় কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী, যেমন মনো (Monod) ভজিয়েছিলেন যে মানুষের আবির্ভাব নেহাতই দুর্ঘটনা বা 'আকস্মিক' আর এই বিশাল মহাবিশ্ব তার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন। এখন অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীই তা আর ভাবতে পারছেন না। এঁদের মধ্যে আছেন খ্যাতনামা রসায়নবিদ ইলিয়া প্রিগোজিন, যিনি লক্ষ করেছেন বস্তুর নিজের মধ্যেই আছে 'আত্মসংগঠনের ক্ষমতা' (self organizing capacity) তথা চেতন-প্রক্রিয়ার গূঢ়াভাস, যেহেতু 'আত্মসংগঠন' একটি সচেতন প্রক্রিয়া ও শুধু স্থানীয়ভাবে নয়, দূরবর্তীভাবেও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ হচ্ছে এর সরবরাহ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। মহাবিশ্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' (open system) আর এদের মধ্যেই ঘটে চলেছে নব নব রূপ ও বিন্যাসের বিবর্তন। সেইসব ব্যবস্থাকেই আমরা 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' বলব, যা ভিতরের ক্ষয় বাইরের পরিবেশে পাঠিয়ে, পরিবেশ থেকে নতুন শক্তি আহরণ করতে পারে ভিতরে। এইজন্য দরকার অবিরাম বাহির ও ভিতরের মধ্যে অবাধ সচ্ছন্দ যোগাযোগ। বন্ধ ব্যবস্থায় এটা ঘটে না, যেমন ধরা যাক থার্মো ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের ভিতর গরম জল কিছুদিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শক্তির সাম্যাবস্থার জন্য। এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু মানবশরীর বা শহর হচ্ছে উন্মুক্ত ব্যবস্থার উদাহরণ, যেখানে অবিরাম বাহির ও ভিতরের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ঘটে চলেছে। যেখানেই স্পন্দন, পরিবর্তন ও নব নব রূপের বিকাশ, সেখানেই লক্ষ করব সাম্যাবস্থা (equilibrium) থেকে দূরে চলে যাওয়া এক অস্থির চঞ্চলতা, কিংবা ওঠা-নামা (Fluctuation)। এই অস্থিরতা একটি সঙ্কটজনক চৌকাঠ পেরুনোর পরই ঘটতে থাকে বিভাজন বা বিভাজন প্রক্রিয়া, যখন নব নব রূপের আবির্ভাব। এই নব রূপের বিকাশ অনিশ্চিত, অনিশ্চিত বলেই বিচিত্র বা বৈচিত্র্যময়, তবু তা যেন এক নিহিত বহুমাত্রিক শৃঙ্খলার প্রক্ষেপ বা প্রতিফলন— এমন কথাও আমরা ভাবতে পারি। শিল্প-সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন এ-কথা আরো বিশেষভাবে সত্য, যদি শিল্প-সাহিত্যকে আমরা একটি 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' হিসেবে দেখি। আধুনিক সাহিত্য এইজন্যই নিছক সমাজবাস্তবতামূলক কিংবা ঐতিহাসিক সাহিত্য নয়, নিছক সামাজিক নয়, এতে সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে পর্যটনের বিবরণ থাকে। মহাবিশ্ব ও মানবচেতনা যেন এখানে একসূত্রে গাঁথা, বস্তুকণিকার অনিশ্চিত আচরণের

সঙ্গে মানবচেতনার অনিশ্চয়তাকেও তাই এখানে মেলানো যায়।

এখানে অতিপরমাণু সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবনাকে, তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না : 'যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু, সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে।'

ব্যাপারটা সত্যিই তাই, অতিপরমাণুকে 'জিনিস' বলতে সত্যিই 'মুখে বাধে' অথচ তা জিনিসও বটে। এবার লেখার ব্যাপারে আবার ফেরা যাক। তবে তার আগে অতি-পরমাণুর সঙ্গে চেতনার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের মিল নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করে নেব, যা আমাদের সাহিত্যভাবনার পক্ষে কাজে লাগতে পারে। এখানে একটি কথা বলে নেয়া দরকার। এই রচনার লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র নন, অথচ যেকোনো সাহিত্য শিক্ষার্থীর মতোই তাঁরও বস্তুর চরিত্র কিংবা বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক ব্যাপারে জানার আগ্রহ আছে আর এইজন্যই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানগুলির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ গাণিতিক ভাষ্য জানা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক ও সম্ভব, এটা যেমন ঠিক, তেমনই গাণিতিক ভাষ্য ছাড়াও বিজ্ঞানের সাধারণ সিদ্ধান্ত, অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণগুলি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাই যেহেতু সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখে থাকেন, সেইহেতু এগুলি একেবারেই সাধারণের অগম্য কিংবা অনধিকার চর্চা এমনও নয়। তবু আমার ভাবনা ও তথ্যে অসম্পূর্ণতা কিংবা ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই সে বিষয়ে যদি কেউ আমার ভুল সংশোধন করে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। এখন আগের কথায় ফের আসা যাক। আমি আগেই বলেছি অতিপরমাণুর সঙ্গে চেতনার আরেকটি বিশিষ্ট মিলের কথা। মিলটি হচ্ছে পরমাণুর মতোই চেতনাও মুহূর্তের মধ্যে স্থান ও কালগত ব্যবধান পেরিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা শুধু খুলে বলা দরকার। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত হচ্ছে দুটি কণিকার মধ্যে এমনকি আলোকবর্ষের ব্যাবধান থাকলেও তারা পরস্পরের মধ্যে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে যোগাযোগ ঘটাতে পারে। যেহেতু পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত অতি-পরমাণুর গতিপ্রকৃতি, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত অনিশ্চিত, অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে পর্যবেক্ষণের সময় কণিকাটির কাছে কোনো না কোনোভাবে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে খবর পৌঁছেছে। অথচ অপেক্ষবাদের সূত্র অনুযায়ী আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে কেউ সঙ্কেত পাঠাতে পারে না। তাহলে ধরে নিতে হয় এই ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পর্যবেক্ষণের সময়ই কোনো স্থানীয় গূঢ় বা নিহিত নিয়ন্ত্রক থেকে। অথচ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কোনো স্থানীয় গূঢ় নিয়ন্ত্রককে বিশ্বাস করে না। তাহলে অবশ্যই মানতে হয় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অসম্পূর্ণ। এটিই ছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের অভিযোগ। এই আপত্তি অবশ্য নীলস্ বোর বা হাইজেনবার্গ মানেননি, তাঁদের মতে যেহেতু দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য অতিপরমাণু একই সমগ্রের অংশ, অতএব দুটি স্বতন্ত্র এলাকার

মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে না, হচ্ছে একই সমগ্রর দুটি অংশের মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি প্রধান তত্ত্বের এই বিরোধ দীর্ঘদিন বজায় ছিল বা আছে। [বিশিষ্ট গণিতবিদ ফন নয়মান একদা গণিতের সাহায্যেই প্রমাণ করেন যে কোনো স্থানীয় গূঢ় নিয়ন্ত্রক বা গূঢ় চলরাশির (hidden variables) অস্তিত্বই নেই।] তবু এই বিরোধ, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অনেকেই মনে করেন বিশেষ একটি বাধাস্বরূপ, বিশেষত যাঁরা আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মিলগুলিকে একত্রে গেঁথে মহাবিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে বুঝতে চান, যেহেতু তাঁদের মতে, এই রহস্যকে বুঝতে গেলে ঐ দুটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মিলন না-ঘটিয়ে কোনো উপায় নেই।

এঁদের মধ্যেই অন্যতম হচ্ছেন ডেভিড বম, যিনি ফন নয়মানের গাণিতিক প্রমাণকে নাকচ করে গাণিতিকভাবেই প্রমাণ করেন গূঢ় নিয়ন্ত্রক বা গূঢ় চলরাশির অস্তিত্ব, কিন্তু যা স্থানীয়ভাবে নয়, অস্থানিকভাবে তথা দূরবর্তীভাবে (non local) দুটি পরমাণুর মধ্যে যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বম একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : ধরা যাক, একটি জলভরা কাচের পাত্র তথা অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে কয়েকটি মাছ আছে। আর তার দুদিকে যথাক্রমে পাশে ও সামনে আছে দুটি ভিডিও ক্যামেরা। এবার অন্য একটি ঘরের দুটি টেলিভিশন পর্দায়, দুদিকের ঐ দুটি আলাদা ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি দেখলে মনে হতে পারে বুঝি একটি পর্দার ছবির সঙ্গে অন্য পর্দার ছবিটির কোনো দূরবর্তী যোগাযোগ ঘটে চলেছে কিন্তু আসলে ব্যাপার হচ্ছে ঐ একই মাছের ছবি দুদিক থেকে দুটি ভিডিও ক্যামেরায় তোলা হচ্ছে ও একটি পর্দায় একটি মাছ পাশ থেকে নড়লে, অন্য পর্দায় সেই একই মাছ সামনে থেকে নড়বে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক একটি বস্তুর দ্বিমাত্রিক চলচ্চিত্র বা প্রক্ষেপ দেখছি আমরা। দুটি কণিকাও এরকমই। এক বহুমাত্রিক নিহিত বা গূঢ় শৃঙ্খলা থেকে পাঠানো একই কণার দুই স্বতন্ত্র প্রক্ষেপ দেখে আমরা ভাবছি দুটি স্বতন্ত্র ও সুদূর বস্তুকণিকার মধ্যে যোগাযোগ ঘটছে। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তা নয়।

যদিও অধ্যাপক বম্-এর এই তত্ত্ব বিতর্ক বহির্ভূত নয়, তবু যাঁরা তাঁর তত্ত্বের বিরোধী এমনকি তাঁরাও তাঁর তত্ত্বের পেছনের গাণিতিক ভাষ্যটিকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে যাঁরাই আইনস্টাইন ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে মিলন ঘটাতে চান, যেমন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোজার পেনরোজ যিনি স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে একত্রে ব্ল্যাকহোল বা কালো গর্তের গাণিতিক সূত্র প্রদান করেন,— তাঁদের কাছে ফন নয়মান বিরোধী বম্-এর গাণিতিক ভাষ্যটি বিশেষ মূল্যবান।

একটু আগেই চেতনার স্থান ও কালগত ব্যবধান পেরুনোর যে বৈশিষ্ট্যর কথা হচ্ছিল এবার তার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। স্মৃতি, বিশেষত দূর অতীত ও দূরবর্তী স্থানের কোনো স্মৃতি যখন আমাদের মনে মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ও প্রায় এক মুহূর্তের মধ্যে মানসচক্ষুতে যখন আমরা ফেলে আসা বহু ঘটনাকে একত্রে স্মরণ করতে

পারি, তখন বস্তুকণিকার অন্তর্নিক যোগাযোগের (non local connection) সঙ্গে তার বেশ মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও আরেকটি ব্যাপারেও এই দুয়ের মিল আছে। তা-হল নতুন কোনো শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় যখন এক ঝলকের মধ্যে শিল্পী বা সঙ্গীতকার দেখতে পান তাঁর গোটা সৃষ্টির চেহারাকে। পেনরোজ চেতনার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্তর্নিক যোগাযোগের ঘটনাটিকে এইভাবেই ঘটতে দেখেছেন। তিনি ইয়োরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকার মোৎজার্ট ও বাখ-এর দুটি সঙ্গীত রচনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, যেখানে মোৎজার্ট ও বাখ্ মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের দুটি বিশিষ্ট সঙ্গীতের পুরো আয়তনটিকে এক মুহূর্তে একত্রে দেখতে পান। বিশিষ্ট গণিতবিদ আঁরি পোয়াঁকারের একটি গাণিতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে, এমনকি পেনরোজের নিজের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে যখন তিনি 'কালো গর্ত' বা ব্ল্যাকহোলের গাণিতিক ভাষ্যের পুরোটি লেখার আগেই তার আভাসটিকে আগেই দেখতে পান তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করার সময়। পেনরোজের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কেননা যন্ত্রমানবের কৃত্রিম বুদ্ধি আদৌ কোনো 'চেতনা' কিনা অথবা যান্ত্রিক বুদ্ধির পেছনে যে গাণিতিক ছক থাকে তা মানবিক চেতনার মূলে কাজ করে কিনা অথবা মানবিক চেতনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'যান্ত্রিক চেতনা'র আবির্ভাব কোনোদিন আদৌ সম্ভব কিনা এ বিষয়ে পেনরোজ একটি মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। পেনরোজের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু যান্ত্রিক বুদ্ধির মূলে আছে গাণিতিক ছক, algorithm) কিন্তু মানবিক চেতনার মূলে তা নেই, যা আছে তা হচ্ছে স্থান-কালের অতীত এক সত্যের মুহূর্তে-উদ্ভাস, সেইহেতু কোনোদিনই মানুষের চেতনার জায়গা যান্ত্রিক বুদ্ধি নিতে পারে না। তাছাড়া মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অতিপরমাণুর স্তরে এক অবিরাম অন্তর্নিক যোগাযোগ ঘটে চলেছে, যার ফলে মস্তিষ্ক কোষ তথা নিউরনগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও রাসায়নিক পরিবেশেও আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে এক অবিরাম অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে চলেছে যার চরিত্র সামগ্রিকভাবে (Globally) নিয়ন্ত্রিত, যা সরলরেখায় ঘটে না, যা অনেকটা মোৎজার্ট ও বাখের শিল্পপ্রেরণায় এক মুহূর্তের সামগ্রিক উদ্ভাসের মতো।

এরপর মানবমস্তিষ্কের গঠনবিন্যাসের সঙ্গে সাহিত্যের একটি যোগাযোগও আমরা লক্ষ করতে পারি। সম্প্রতি কালে মস্তিষ্ককোষবিদ্যার (neurology) একজন বিশিষ্ট গবেষক পল ম্যাকলিন লক্ষ করেছেন মানুষের মস্তিষ্কে পরপর তিনটি স্তর আছে অথবা এ-ও বলা যায় যে বস্তুতপক্ষে, আমাদের একটি মাথার মধ্যেই আছে তিনটি মস্তিষ্ক। এর সবচেয়ে উপরেরটি হচ্ছে সবচেয়ে নতুন মস্তিষ্ক যাকে বলা হচ্ছে নিও-করটেক্স যার দৌলতে আমাদের homo sapiens বা 'প্রাজ্ঞ মানুষ' বলা হয়। এর নিচের ধাপে আছে স্তন্যপায়ী-মস্তিষ্ক ও একেবারে নিচে আছে সবচেয়ে আদিম সরীসৃপ-মস্তিষ্ক। নিও-করটেক্স হচ্ছে যুক্তি, অনুভব, শিল্পসাহিত্য, অধ্যাত্মচিন্তা, গণিত, জ্যামিতি,

বিজ্ঞান ইত্যাদির আধার, স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কে আছে তীব্র আবেগ, স্মৃতি, উন্মাদনা, ভয়, উৎকণ্ঠা, পরার্থপরতা ইত্যাদি। এই মস্তিষ্ককে Limbc-system-ও বলা হয়। এর নিচে অর্থাৎ সর্বশেষে আছে সবচেয়ে আদিম তথা সরীসৃপ-মস্তিষ্ক যাকে ম্যাকলিন বলছেন Reptile-complex বা সংক্ষেপে R-complex এতেই আছে আদিম পশুর পাশবিক ঈর্ষা, রাগ, হিংস্রতা, অবাধ যৌন পিপাসা, দমন-পীড়নের ইচ্ছা, ধর্ষকাম, রিরংসা। অর্থাৎ সোজা কথায় বিবর্তনের যে তিনটি প্রধান ধাপ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেই স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ যুগের দুটি মস্তিষ্ককে আমাদের মাথা থেকে প্রকৃতিদেবী বাদ দেননি, বরঞ্চ ঐ দুই মাথার ওপরেই সংযোজন করেছেন নব্যমস্তিষ্ক তথা নিও-করটেক্স। ফলে মানুষের চেতনায় ও কাজে যে পাশবিক প্রবৃত্তি আমরা লক্ষ করি, তার ইতিহাস জুড়ে যে বারবার নৃশংস অত্যাচার, দমন-পীড়ন, রক্তলোলুপতা, ধর্ষকাম আর হত্যাস্পৃহা লক্ষ করি, সেসবই আমাদের ঐ সরীসৃপ-মস্তিষ্কের উত্তরাধিকার। ব্যবসায়িক ফিল্ম বা সাহিত্যেরও যে দুটি প্রধান অবলম্বন আমরা দেখি, তা হল উগ্র যৌনপিপাসা ও হিংস্রতা তথা হত্যাস্পৃহা। উগ্র রাজনৈতিক সাহিত্যেরও অবলম্বন হচ্ছে হিংস্রতা তথা দমন, নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস। সাধারণ পাঠকের আদিমতম প্রবৃত্তি যা সরীসৃপ-মস্তিষ্কের অবদান তাকেই নানানভাবে উসকে দেয়া হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক সাহিত্যের লক্ষ্য। যখনই কোনো পাঠক গো-গ্রাসে হিংস্রতা, ধর্ষকাম, যৌনক্ষুধা কিংবা উপর্যুপরি যৌন কর্মকাণ্ডের বিবরণ পড়ে রোমাঞ্চিত হন, তখনই বলা যায় তিনি তাঁর সরীসৃপ-মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন, শারীরিক অবস্থার দিক থেকে দেখলে তখন তিনি এক ভয়ঙ্কর মৃগী রোগের শিকার, যা বস্তুতপক্ষে হচ্ছে মস্তিষ্কবিবর্তনের দিক থেকে কয়েককোটি বছর পিছিয়ে যাওয়া। একটি বিশেষ মৃগী রোগ, যেমন Grand mal epilepsy-র ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সামগ্রিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ (regression)। যখন নব্য-মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে চেতনা সরীসৃপ-মস্তিষ্কের দিকে পেছিয়ে যায় সমাজ বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা আর নিছক মৃগী রোগ থাকে না, এটা হয়ে যায় ফ্যাসিবাদের মতোই এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি যার প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী। এবার বলা যায় গণতন্ত্রী বা সাম্যবাদী যে ব্যবস্থাই হোক না কেন, যেখানেই দেখা যাবে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে উসকে দেয়ার চেষ্টা, তথা রিরংসা, ধর্ষকাম ও হিংস্রতাকে ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা সেখানেই সরীসৃপ-মস্তিষ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে, বুঝে নিতে হবে।

অতএব আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই এর বিরুদ্ধে। এইজন্যই আধুনিক সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীতধর্মী শব্দব্যঞ্জনা ও চিত্ররূপময় চিত্রকল্পের ব্যবহার, যা একটি অতীন্দ্রিয় চেতনা বা কালহীন সত্যের মূলভূমি খুঁজে দেখতে চায়, যাকে অধ্যাপক ডেভিড্ বম্-এর ভাষায় এক গূঢ় শৃঙ্খলাও (implicate order) বলা যেতে পারে।

আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় একই ব্যাপার দেখব। দেখব এখানে সরল-

রেখায় কোনো ঘটনা ঘটে না, প্লটের পর প্লট এখানে নেই, বরঞ্চ এখানে এক মুহূর্তে স্মৃতির উদ্ভাসের মতোই গোটা রচনার বিন্যাসে আছে এক সমগ্র স্মৃতিচারণ।

তাহলে একটি ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার হতে পারছি আর তা হচ্ছে লেখক এক্ষেত্রে যেমন আত্মজীবনী লেখেন না, স্বীকারোক্তি লেখেন না, তেমনই ডাক্তারের মতো অপরের চিকিৎসা করেন না, লাশ কাটেন না টেবিলে, উকিলের মতো অন্যের মামলা লড়েন না। তাঁর ইচ্ছা বা কাজ অনেকটা জীবনানন্দর কারুবাসনার নায়কের ভাষায় বলা যায় :

'... এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।' (পৃ. ৫)

সৃষ্টির রহস্যের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের রহস্যকে এইভাবে একাত্ম করতে গিয়ে, অথবা অন্যভাবেও বলা যায় নিজের হৃদয়ের রহস্যের ভিতর সৃষ্টির রহস্যকে অনুভব করতে গিয়ে লেখক আলো অন্ধকারের পথে অন্তর্ভ্রমণ শুরু করেন। সমস্ত মানবিক সম্পর্ক, সমস্ত মানবিক ঘটনাকে ভিতর থেকে দেখতে চান তিনি, তাই ঘটনা এখানে গৌণ, ঘটনার পেছনে যে মানবিক সম্পর্কের অবিরাম ক্ষয়, প্রায় দুশ্চিকিৎস্য যে অনিশ্চয়তা রয়েছে মানবচরিত্রের তথা মানবচিত্তের গোপনে ; যে অকথ্য বিকার রয়েছে, অপচয় রয়েছে মানব-স্বভাবের গোপনে— যার হাত থেকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কোনো আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের নিস্তার নেই,— একথাই নানানভাবে ধরা পড়ে তাঁর কাছে। অবিরাম যেমন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, তেমনি অপরকে ; তেমনি অপরলোকও তাঁকে প্রশ্ন করে— আর এভাবেই চলে সংলাপের পর সংলাপ, আর এইজন্যই এই ধরনের গদ্যে থাকে সংলাপের এক বিস্ফোরণোন্মুখ প্রাচুর্য যাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যদিও এটা কোনো আদর্শ দৃষ্টান্ত নয়। এখানে কথা হচ্ছে হেম অর্থাৎ উপন্যাসের তরুণ নায়ক ও তার মার মধ্যে :

— 'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। (হেম)

— কার ? তোমার ? কেন ? (মা)

— চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সেরকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছা করে ; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না-আসি।

— ও এইরকম ? কিন্তু এতো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায় ?

— গঙ্গার একটা ঘাট।

— কোন দিকে বলোতো ?

— তুমি দেখোনি।'

... ...

— 'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা ?

— কেন সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন ?
— কিংবা খুন করে জেলে গেলে ?
— স্ত্রী সন্তান আছে। মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ ?
— জেলের বাইরে থেকেই বা কী করতে পারি ?
— বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'

মাথা নেড়ে— 'হৃদয়ে যদি বিশ্বাস থাকত, তাহলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'
— 'কী সে বিশ্বাস ?'
—'যে বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায়। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

এবার আমরা লক্ষ করব, উপরের দুটি উদ্ধৃতিতে আত্মহননের ইচ্ছা ও চূড়ান্ত বিশ্বাস-হীনতার কথা বলা হয়েছে যা বলা যেতে পারে আমাদের সময়ের একটি সাধারণ লক্ষণ। এই রচনার শুরুতেও যেখানে বই কেনার উল্লেখ আছে তার পরেই আছে উইপোকার কথা। আরেক জায়গাতেও আছে কবিতার খাতা উইপোকায় কেটে দেওয়ার উল্লেখ। কিছু পুরোনো চিঠিও গেছে উইয়ের পেটে। 'চিঠিগুলো উইয়ের পেটের ভিতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।' এই সবকিছু মিলিয়ে দেখলে মানবজীবনের অবিরাম ক্ষয়, অপচয়, ধ্বংসের দিকে তার অবিরাম এগিয়ে চলা, তার নশ্বরতার কথা যেমন মনে পড়বে, তেমনি আরেকদিকে আমরা দেখব : 'নানারকম কণ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি ; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।' অর্থাৎ মানুষের মেধা, মনীষা ও কল্পনাশক্তি তথা সৃষ্টিশীলতা যাকে জীবনানন্দ বলবেন, 'কারুতন্ত্র' বা 'কারুবাসনা' তারও অনিবার্য উত্থান, বলা যেতে পারে তারই অমোঘ টানে, একজন অবৈধ, অস্বাভাবিক মানুষ এগিয়ে চলেন, (যিনি সামাজিক দিক থেকে সর্বৈব ব্যর্থ। ব্যর্থ কিন্তু পরাজিত নন) ইতিহাস থেকে ইতিহাসের বাইরের দিকে, কেননা ইতিহাসের বাইরেই আছে সৃষ্টির রহস্য, যা কোনোদিনই হয়ত বোঝা যাবে না, অন্তত বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নয়। আগেকার দিনে অনেকেই সবকিছু 'বিজ্ঞানসম্মত' করতে চাইতেন, তাঁদের ধারণা ছিল বিজ্ঞানই এই মহাবিশ্বের সমস্ত জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে, সৃষ্টির রহস্য উদ্ধারের চাবি, ঠিকই, বিজ্ঞান একদিন জোগাড় করে ফেলবে। এখন দেখা যাচ্ছে বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞান আগের তুলনায় অনেক বেশি বিনয়ী, এই বিজ্ঞান মানবিক জ্ঞানের সীমা স্বীকার করে, এবং মেনেও নেয় যে সৃষ্টির অনেক কিছুই আলো অন্ধকারে ঢাকা, অসীম রহস্যময়। তবু দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে, থাকা স্বাভাবিক। তবে সাহিত্য মানেই হচ্ছে সমাজসমগ্র তথা লোক-সমগ্রর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সমাজপ্রগতির মূল ধারা বা মূল ঝোঁকটিকে সাহিত্যে প্রতিফলিত, প্রতিষ্ঠিত কিংবা 'শিল্পায়িত' করে তোলা এমন ধারণাকে যদিও

এখনো কেউ কেউ মোটাভাবে আবার কেউ কেউ সূক্ষ্মভাবে প্রশ্ন দিয়ে থাকেন, তবুও এটা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে লোকসমগ্রই শেষ কথা নয়, কেননা মানবসমাজকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তাকে সমগ্রসৃষ্টির একটি শৃঙ্খলে গাঁথা হয়ে থাকতে হবে, অন্তত আধুনিক যুগে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন তাকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে। ফলে অরণ্য-নদী-পর্বত সংরক্ষণ তার এখন জরুরি কাজ, বন্যপ্রাণী কীটপতঙ্গ পাখি ফুল যা কিনা আগেকার দিনে তথাকথিত বাস্তববাদী বা বস্তুবাদী রাজনৈতিক লেখকদের কাছে হাসিঠাট্টার খোরাক ছিল, তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই কেবলই মানবসমাজ নয়, মানুষের ঐতিহাসিক সত্তার কথা নয়, ইতিহাস নয়, তার প্রাকৃতিক সত্তার কথাও ভাবতে হচ্ছে খুব জোর দিয়ে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবনানন্দর লেখায় পাড়াগাঁর গাছগাছালি নদী পাখি রাত্রি রাত্রির আকাশের অন্ধকার আগের চেয়ে আরো ঢের অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (এরই পশ্চাৎপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও আমাদের কাছে সমানই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।)

তবু ১৯৩৩-এ লেখা এই উপন্যাস 'কারুবাসনা' পাঠ করে কেউ কেউ হতচকিত হয়ে যেতে পারেন এই ভেবে যে যখন দুনিয়াজোড়া মন্দা, জর্মানিতে নাৎসিবাদের আবির্ভাব রাশিয়ায় জবরদস্ত মার্কসবাদের জয়জয়কার, ইয়োরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপুল অস্থিরতা, সেই সময় পূর্ববাঙলার এক পাড়াগাঁর গাছগাছালির ভীড়ে অন্ধকার বর্ষার রাতে এক কাব্যবিলাসী তরুণের একী আত্মকথন! কোনো রাজনৈতিক সংগ্রামচেতনা নেই, ইতিহাস চেতনা নেই বরঞ্চ তার পরিবর্তে আত্মহননের ইচ্ছা, আত্মবিলাপ, প্রেম আর ব্যর্থ প্রেম! জীবনানন্দর কাছে তখনই যদি ইতিহাসের ধূসর মূর্তি আরো ধূলিধূসর হয়ে যায় তাহলে কে তাঁকে দোষ দেবে, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস ইহুদী হত্যা, রাশিয়ায় গণশ্রম শিবিরের খতম কাহিনী, ভিয়েতনামে দানবিক ও নৃশংস মার্কিনী কার্যকলাপ, বুদাপেস্তে রুশ আক্রমণ তিয়েন-আন-মেনে ছাত্রহত্যা এসব পরবর্তী কালে একের পর এক ঘটে গেল। বরঞ্চ বলা যায় যে মৌলিক মানবিক বিকার ও অপ্রেম থেকে এসব ঘটনা ঘটে, তারই দৈনন্দিন চেহারা আমরা সাদামাটা ভাবে রোজই দেখি চারপাশের সফল ও সাফল্যসন্ধানী লোকদের ভিড়ে, আর তাদেরই প্রত্যাখ্যান করে যে 'অবৈধ ও অস্বাভাবিক লোকটি' ছাইধুলো ও কালিতে ভরে ফেলে নিজের সংসার, তাকেই কবি অর্থাৎ দ্রষ্টা বলি আমরা অর্থাৎ সেই হচ্ছে কারুবাসনার নায়ক। কিন্তু শুধু তাই নয়, ইতিহাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদও আছে। কেন আছে? এবার সেটা বই থেকে শোনা যাক :

— 'দেখো, কেমন লেবুগাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা?'

বাবা একটু চুপ থেকে— 'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে— 'এমনি পাড়াগাঁ-র এইসব রাত তোমার খুব ভালো লাগে

বুঝি ?'

মনে মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিস। জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারাজীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই— বেঁচে থেকে বিছানায় শুয়ে, গড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি— কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম— 'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার ; চারদিকে এই আম-জাম-কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

বলা যেতে পারে জীবনানন্দর লেখায় সক্রিয়, সচেতন অথবা সংগ্রামী রাজনীতিহীনতার কিংবা আর্থ-সামাজিক চেতনার অভাবের অভিযোগের উত্তর হচ্ছে উপরের ওই ক'টি লাইন। আধুনিক গদ্যের শিল্পভাবনায় যদি ওই একই ঘাটতির নালিশ কেউ তোলেন, তাহলে তার উত্তর ওই একই।

কিন্তু আগে বলেছি, আত্মহননের ইচ্ছা, বিশ্বাসহীনতা, অপচয়, ক্ষয় এসব হচ্ছে আমাদের সময়ের সামান্য লক্ষণ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এটি শুধু আমাদের সময়ের সংকট নয়, এটি হচ্ছে মানবচিত্তের একটি মূল সংকট, যেহেতু মনের একটি দার্শনিক কারখানা আমরা বানিয়েছি অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের সাহায্য নিয়ে এই উদ্দেশ্যে যে যুক্তির সাহায্যে আমরা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে, পরমাণুর আচরণ তথা মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য এ সবকিছুকেই একটি ফর্মুলায় বা কার্যক্রমে বেঁধে আনতে পারব। এখন অনেক গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী বলছেন তা সম্ভব নয়। যেমন অতিপরমাণুর ক্ষেত্রে তেমনই চেতনার ক্ষেত্রে রয়েছে সুদূরের এক গূঢ় কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত এক অনিশ্চয়তার খেলা যদিও তার মধ্যে একটি সম্ভাব্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁক রয়েছে।

আধুনিক গদ্যসাহিত্য হচ্ছে এই সুদূরের এক গূঢ় রহস্যকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনিশ্চয়তার সাহিত্য, নায়ক এখানে নিশ্চিত সাফল্যের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত রাস্তায় হাঁটতে থাকে, কেননা সে অনুভব করে তার বাড়ি এখানে নয়, অন্য কোথাও, যাকে আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় 'ব্যর্থতা', কিন্তু বস্তুতপক্ষে সাফল্য ও ব্যর্থতার বাইরের এক অবস্থান, যেখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দিয়ে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দিয়ে লেবুফুলের গন্ধে ভরপুর বর্ষার রাতের অন্ধকার নিবিড় স্তব্ধতায় এক অনাস্বাদিত রহস্যের আস্বাদ পান— যা ইতিহাস নয়, যা তার বাইরের কোনো দূর রহস্যলোকের ইঙ্গিত।

এবার শেষ করার আগে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই ! এই লেখায় আধুনিক গদ্যের আধুনিকতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এই রচনাকারের ব্যক্তিগত অভিমত। এর চেয়ে ভিন্ন, উৎকৃষ্ট ও সঠিক মতামত থাকা শুধু সম্ভব তা-ই নয়, থাকা স্বাভাবিক। অতএব বর্তমান রচনাটিকে একটি ব্যক্তিগত রচনা বলাই ভাল। □